ATHENA, VOLUME X, JULY 2026 C.E. (ISSN: 2454-1605), pp. 188-195
www.athenajournalcbm.in

বিংশ শতকের রাজনৈতিক বন্দিনীদের লেখনিতে কারাগারের ভিন্নকথা: একটি পর্যালোচনা

এলিজা রায়* ও মৌপিয়া রায়**

প্রাপ্ত: ২২.০২.২০২৬ পরিমার্জন: ১৪.০৫.২০২৬ গৃহীত: ০৬.০৬.২০২৬

সারসংক্ষেপ: *কারাগার সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু 'কারাগার' শব্দটি শুনলেই সাধারণত আমাদের চোখের সামনে এক নরকসম জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সেই অর্থে সংগঠিত কারাব্যবস্থা ছিল না এবং অপরাধমূলক কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত, প্রহার ও অঙ্গচ্ছেদের মতো অমানবিক শাস্তি প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরেই ভারতবর্ষে আধুনিক কারাব্যবস্থার সূচনা হয়। প্রাথমিক পর্বে কারাগারে পুরুষ-বন্দিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়; নারীবন্দিনীদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই হাতে গোনা। তবে বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলায় নারীবন্দিনী-দের সংখ্যা হঠাৎ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে; এর কারণ ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বিশেষভাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি। উল্লেখ্য, নারীবন্দিনী-দের আত্মজীবনীগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা কারাগারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আত্মিক বন্ধন, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারি। এগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, ঔপনিবেশিক বাংলায়, কীভাবে নারীবন্দিনীরা তাঁদের কারাজীবনকে সহজ ও প্রাণবন্ত করে তুলত। একইভাবে স্বাধীনোত্তর পর্বে ১৯৬০, ১৯৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীরাজবন্দিদের সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে। সেক্ষেত্রেও কয়েকটি আত্মকথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর উপর ভিত্তি করে এই নিবন্ধে স্বাধীনোওর পর্বে কারাগারে মহিলাদের অবস্থা, পারস্পরিক বন্ধন, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, কারা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ইত্যাদি এবং পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *কারাগার, নারীবন্দিনী, ফিমেল ওয়ার্ড, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, হাঙ্গার স্ট্রাইক, বিংশ শতক।*

---

*অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ড. কানাই লাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: elizaroy95@gmail.com
**স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ, বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
moupiaroy2012@gmail.com

কারাগারের ইংরেজি শব্দ হলো প্রিজন, যা ফরাসি শব্দ প্রিসাউন থেকে এসেছে। কারাগার হলো রাষ্ট্র পরিচালিত একটি নিরাপদ স্থান, যেখানে আইনগত প্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হেফাজতে রাখা, শাস্তি কার্যকর করা এবং প্রয়োজনে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা হয়। পূর্বে জেলখানাকে মনে করা হতো এক ধরনের বন্দিশালা, যেখানে অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করেন যে, কারাব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে ক্রমে কারাগারের কার্যাবলি কেবলমাত্র শাস্তিপ্রদানের স্থান থেকে বিকশিত হয়ে পুনর্বাসনের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।[১]

প্রাচীন যুগে ভারতীয় সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধীদের পুনরায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা। বাসুদেব উপাধ্যায় তাঁর *A Study Of Hindu Criminology* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসি, বেত্রাঘাত ও প্রহার এসবই তখন শাস্তিপ্রদানের স্বীকৃত উপায় ছিল। বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হতো এবং পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের অকল্পনীয় যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হতো। প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আইনসংহিতা গুলিতে উল্লেখ রয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি হিসেবে কারাবাস প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলিতেও কারাগার সম্পর্কিত উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা পর্যটক *হিউয়েন সাঙ* তাঁর বিবরণে তৎকালীন ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং সেই বিষয়ে উপযুক্ত শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[২]

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের কারাব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের মধ্যযুগীয় সভ্যতার যথেষ্ট মিল ছিল। সেই সময় কুরআনকে বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বা আইন গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হতো। তৎকালীন সময়ে কারাগার-গুলো সাধারণত দুর্গ, প্রাসাদ বা দূরবর্তী স্থানে নির্মিত হতো যাতে বন্দিরা পালাতে না পারে। সত্যপ্রসাদ সংগর তাঁর *Crime And Punishment In Mughal India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মুঘল ভারতে তিনটি উল্লেখযোগ্য কারাগার ছিল গোয়ালিয়ার, রণথম্বর ও রোহতাস-এ। এই কারাগারগুলো মূলত রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং সেখান থেকে খুব অল্পসংখ্যক বন্দি জীবিত হয়ে ফিরে আসতে পারত। অস্থায়ীভাবে বন্দিদের আটক রাখার জন্য শহরগুলিতে পুলিশ-লকআপ ছিল। যেগুলোকে বলা হতো *চাবুতরা-ই-কতোয়ালি*।[৩]

প্রাক-ঔপনিবেশিক সময় থেকে যে অমানবিক শাস্তিসমূহ ভারতে প্রচলিত ছিল, ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনাপর্বেও সেগুলির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে কোম্পানির কর্মকর্তারা এই অমানবিক শাস্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ফলত, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই কোম্পানি অপরাধের বিচার ও দণ্ডবিধি প্রশাসনের ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছিলেন। তাঁর আমলেই কারাবাস একটি নিয়মিত দণ্ড হিসেবে চালু হয়। ঔপনিবেশিক কারাব্যবস্থার ওপর প্রথম পদ্ধতিগত অনুসন্ধান শুরু হয় ১৮৩৬-৩৮ সালের *Prison Discipline Committee*-এর মাধ্যমে, যার সদস্য ছিলেন লর্ড মেকলে, যিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির মূল প্রণেতা। এই কমিটির প্রতিবেদন ভারতে কারাগার সংস্কারের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নির্দেশ করেন।[৪]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে মূলত রাজনৈতিক বন্দিদেরই কারাগারে আটক রাখা হতো। কিন্তু আধুনিক কারাগার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বন্দিদের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বন্দিদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়—

- অপরাধী বন্দি বা *criminal prisoner*
- রাজনৈতিক বন্দি বা *political prisoner*
- কিশোর বন্দি বা *juvenile Prisoner*
- সামরিক বন্দি বা *military prisoner*
- ইনমেটস
- মহিলা বন্দি বা *female prisoner*[৫]

ঔপনিবেশিক কারাব্যবস্থায় নারীদের কথা

আধুনিক কারাব্যবস্থার গোড়াপত্তনের সময় কারাগারে নারীবন্দিদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশেষত বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নারীবন্দিদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ঔপনিবেশিক কারাগারের ইতিহাসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। অনিমেষ বাগ তাঁর *The colonial Prison in Bengal, 1860-1945* গ্রন্থতে দেখিয়েছেন, ১৯২০ দশকে বিপুলসংখ্যক নারী রাজনৈতিক বন্দি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করে এক ধরনের স্বাধীন পরিসর সৃষ্টি করেছিলেন; তাদের সংহতি ও প্রতিরোধ ঔপনিবেশিক সরকারকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল। এমন দুজন রাজনৈতিক নারীবন্দিনী হিসাবে বীণা দাস ও কমলা দাশগুপ্তের নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৬] *Geraldine Forbes* তাঁর *Women In Modern India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বীণা কৈশোর থেকেই পিতা বেণীমাধব দাস, যিনি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষক ছিলেন, তাঁর আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমমূলক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হন। বেথুন কলেজে পড়ার সময় বীণা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সায়মন কমিশন বয়কট ও পিকেটিং আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রদানকারী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন বক্তৃতা দিতে উঠলে বীণা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকেন, কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং বীণা গ্রেপ্তার হন।[৭] অন্যদিকে কমলা দাশগুপ্ত এম.এ. পাঠরত অবস্থায় রাজনৈতিকমনস্ক হয়ে ওঠেন; বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কাছে তিনি লাঠিখেলা শিখতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীতে যুগান্তর দলের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে যুগান্তর দলের নেতা রসিকলাল দাসের প্রেরণায় গান্ধীজির অহিংসবাদ ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য যুগান্তর দলে যোগ দেন। জানা যায়, তিনি বীণা দাসকে রিভলভার সরবরাহ করেন, যা দিয়ে তিনি স্ট্যানলি জ্যাকসন-কে হত্যার চেষ্টা করেন। বোমা মামলার সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৩২-৩৮ সময়কালে তিনি প্রেসিডেন্সি ও হিজলি জেলে বন্দি থাকেন।[৮] বীণা দাস তাঁর *শৃঙ্খল ঝংকার* এবং কমলা দাশগুপ্ত তাঁর *রক্তের অক্ষরে* গ্রন্থে তাঁদের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা, কারাগারে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য বন্দিদের সাথে আত্মিক বন্ধন-এর বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে, কারাগারে নরকসম জীবনকে তাঁরা কীভাবে সহজতর করে তোলার চেষ্টা করতেন এবং প্রত্যেকটি দিন কিভাবে অতিবাহিত হতো।

১৯৩০ সালে কমলা দাশগুপ্ত যখন প্রেসিডেন্সি জেলে পা রাখছেন, তখন তাঁর মনে হচ্ছে এটি যেন একটি বিশাল দৈত্যপুরী। তিনি দেখাচ্ছেন, জেলগেটে সিপাহীরা যন্ত্রের মতো দাঁড়িয়ে আগত কয়েদিদের সংখ্যা খাতায় লিখে নিচ্ছেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলছেন, জেলে মানুষ আর মানুষ নয়, শুধু সংখ্যামাত্র। জেল অফিসের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং নির্মম। সিপাহীরা এমনভাবে বন্দিদের তল্লাশি করছেন যেন তাদের জিনিসপত্র ইতোমধ্যেই জেলের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউতে প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল ওয়ার্ড তখন পরিপূর্ণ। নারীবন্দিনী-রা প্রায় ঠাসাঠাসি করে থাকত সেলগুলিতে, অর্থাৎ কারাবন্দিদের থাকার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তখনও তৈরি হয়নি। কারাগারে দিন অতিবাহিত করার অন্যতম রসদ ছিল অন্যান্য বন্দিদের সাহচর্য। সেখানে কেউ হয়ে উঠছেন মা, কেউ দিদি বা কেউ বোন। কমলা দাশগুপ্ত দেখাচ্ছেন, প্রেসিডেন্সি জেলে একজন মুসলমান মেয়ের সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল, তিনি অবলীলায় মেঘনাদবধ কাব্য পড়তে পারতেন। বহরমপুর জেলে বদলি হয়ে যাওয়ার দিন এই মহিলা তাঁর কমলা দিদিকে যত্নে খাইয়ে দিচ্ছে এবং চুল বেঁধে দিচ্ছে, সেদিন যেন তাঁর কাজের অন্ত নেই। রাত্রিবেলা ছাড়া নারীবন্দি-রা খুব একটা কঠোর নজরদারিতে থাকতেন না। ফলে তারা একে অপরের সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা, মনের কথা ভাগ করে নিতেন। কেউ এদের মধ্যে খুঁজে পেতেন তাদের পরিবারের সদস্যদের। কমলা দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন লাবণ্য মাসিমার কথা, যিনি তাঁর কন্যা শোভারানীকে খুঁজে পেতেন তাঁর মধ্যে। যিনি নিজের জীবন উপেক্ষা করেও কমলার অনেক অন্যায় আবদার বজায় রাখতেন।[৯] *শৃঙ্খল ঝংকার* গ্রন্থে বীণা দেখাচ্ছেন, তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে এসেই খুঁজে পাচ্ছেন তাঁর সহপাঠী মনুকে, যিনি যত্নে বীণাকে স্নানের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং জেলে প্রবেশ করার পর বীণার চেহারা যে কতটা খারাপ হয়ে গেছে তা

তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কোর্টে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে বীণাকে তাঁর সহবন্দিনী-রা কেউ খদ্দরের শাড়ি, কেউ টিপ বা কেউ চুড়ি পড়িয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ তারা যেন ভয়কে জয় করার চেষ্টা করছেন, আদালতে গিয়ে কী বিচার হবে সেই ভয়ে ভীত না হয়ে জীবনকে উপভোগ করতে চাইছেন, পেতে চাইছেন ক্ষণিকের আনন্দ। কারাগারের অভ্যন্তরেই রাজনৈতিক বন্দিনীরা নিজেদের একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। বীণা দেখাচ্ছেন, মেদিনীপুর জেলে গিয়ে তিনি শান্তি ও সুনীতির সাথে পুনরায় মিলিত হচ্ছেন। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেনসকে হত্যা করার অপরাধে তারা জেলে এসেছিলেন। জেলের মধ্যে তাঁরা আলোচনা করতেন তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা। কারাগারের এই বদ্ধ দশা তাঁদের আত্মপ্রত্যয় ও সাহসকে ভেঙে দিতে পারেনি, তাঁদের চোখে বিদ্রোহের আগুন তখনও নিভে যায়নি, তাঁরা গান গাইছেন—

চলে বন্ধুবিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট কলঙ্কলেখা
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একই বলিদান
জাগে নিঃশঙ্ক শংকর তাজিয়া শ্মশান।[১০]

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, জেলের মধ্যে শিশুর অভাববোধ ছিল। কিন্তু ফিমেল ওয়ার্ডে বোধহয় সেই অভাববোধ ছিল না। বীণা দাস দেখাচ্ছেন, শিশুদের কলহাস্যে জেলখানা সবসময় মুখর হয়ে থাকত, এদের কারো সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে পড়তেন নিবিড়ভাবে। কারাগারে এই শিশুরা ছিল একটুকরো ঠাণ্ডা বাতাসের মতো। নারায়ণ নামক একটি চার বছরের শিশুর সাথে তাঁদের ভারী ভাব জমে উঠেছিল। তার বাবা ছিল বিচারাধীন আসামি। ছেলেটিকে সর্বদা মাতৃস্নেহে আগলে রাখত বন্দিনীরা। বীণা দেখাচ্ছেন, তাকে বিস্কুট দিতে চাইলে সে এসে জড়িয়ে ধরত, অর্থাৎ মাতৃহারা শিশুটি চাইত স্নেহ, ভালোবাসা। এই বন্দিনীদের মধ্যে সে খুঁজে পেতে চাইত তার মাকে।[১১] এই রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে সাধারণ বন্দিদের এমন আত্মার সম্পর্ক তৈরি হতো যে, যখন কোনো বন্দি অন্যত্র স্থানান্তরিত হতেন, তখন তাকে চোখের জলে বিদায় দেওয়া হতো, যেন তারা তাদের নিজ গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কমলা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন *"বিদায় নেওয়ার সময় তারা সারি বেঁধে কাছে এসে দাঁড়ায়, সজল চোখে বলে- আবার এসো দিদিমণি। কী করুণ, কত গভীর দুঃখের সেই চাহনি। কখন যে তারা এত ভালোবেসেছে, কখন যে এত আপন হয়ে গেছি কে জানে।"*[১২]

কারাগারে অবসর সময় বন্দিনীরা বই পড়ে কাটাতেন। *স্টেটসম্যান, সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী* প্রভৃতি কাগজ আসত, যদিও সেখানে রাজনৈতিক খবরগুলি কালি দিয়ে ঢাকা থাকত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বই, বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বই ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী। বীণা দাস বলছেন *"বরদার বহু যত্নের লাইব্রেরির প্রত্যেকটি বই-ই প্রায় জেলের মোটা মোটা স্ট্যাম্পের ছাপ আর অফিসারদের নানারকম হস্তাক্ষরে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছিল"*। পড়াশোনা ছাড়াও খেলাধুলা, গান, অভিনয়, প্রতিযোগিতা, তর্ক আলোচনা ইত্যাদি সবকিছুই তাদের মনোরঞ্জনের উপাদান ছিল। সব মিলিয়ে হিজলি জেল ছোটোখাটো শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল। বর্ষামঙ্গল, রবীন্দ্রজয়ন্তী বা বিজয়া সম্মেলনীর মতো প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান পালিত হতো।[১৩] বন্দিনীরা তাঁদের নিজস্ব শখ পূরণ করতে পারতেন। এই বিষয়ে আর্টিস্ট ইন্দুসুধা ঘোষের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে জেলে ছবি আঁকতেন। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কারাগারের তুলনামূলক নমনীয় দিকটি তুলে ধরা যায় যে, তারা বন্দিনীদের *'নিজস্ব সময়ে'* সর্বদা হস্তক্ষেপ করতেন না। তাঁরা বাগানে রজনিগন্ধা, বেল, জুঁই, মধুমালতী প্রভৃতি গাছ বসাতেন। ইন্দুসুধার একটি মজার কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন কমলা দাশগুপ্ত। কাপড়ের ন্যাকড়া ছোটো টুকরো করে কেটে ময়দা ঘন করে গুলে ন্যাকড়াগুলি দীর্ঘক্ষণ তাতে ডুবিয়ে রাখে, এগুলি দেখতে হয় ঠিক রাবড়ির মতো এবং সেই রাবড়ি সে তাঁর সহবন্দিনীদের যত্ন করে খাইয়ে দেন্। পুরো ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে হিজলির কারাগারের আকাশ বাতাস। হিজলিতে আবার বীণা দাস, শান্তি ঘোষ ও কমলা দাশগুপ্তের পুনর্মিলন ঘটে। তাঁরা একসাথে গল্প করেন, তাস খেলেন্, বইয়ের গভীর আলোচনার মাধ্যমে মরুভূমিময় জেলজীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেন। এই আবেগপূর্ণ বন্ধন নারীদের শক্তি জোগায় কারাগারের কষ্ট সহ্য করতে।[১৪]

কারাগারের বন্দিনীদের মধ্যে একতা তাঁদের সাহস জুগিয়েছিল, কারা কর্তৃপক্ষ তথা ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেলের ভেতর জমাদারনী একজন চিররুগ্ন হাঁপানির আসামিকেও অকথ্য অত্যাচার করতে পিছপা হতেন না। জ্বরে ভুগছে এমন একজনকে জোর করে জাঁতার সামনে বসে কাজ করতে বাধ্য করা হতো, এর পাশাপাশি চলত কারাগারের ফিমেল ওয়ার্ডে এসে নানারকম অত্যাচার, অনাচার। সুপারিনটেনডেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগ জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি, বরং চোখের সামনে অনাচার সহ্য করতে না পারলে চোখ বন্ধ করে রাখার নিদান দেন তাঁরা। ফলে বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরীরা শুরু করেন অনশন। তাঁদের সাথে যোগ দেন অন্যান্য বন্দিরাও। প্রতিবাদস্বরূপ সবাই খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সমস্ত ফিমেল ওয়ার্ডের ভাত ফিরে যাওয়ায় সারা জেলে হইচই পড়ে যায়। অসুস্থ হয়ে পড়ায় বীণা ও তাঁর সঙ্গীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সুপারিনটেনডেন্টের হস্তক্ষেপে জেলারকে অপসারিত করা হয় এবং অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।[১৫] কেভিন গ্রান্ট তাঁর গ্রন্থ *Last Weapons* (2009)-এ আইরিশ সুফ্রাজেটদের অনশন ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে লিঙ্গ রাজনীতির যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা এখানে প্রাসঙ্গিক। পুরুষবিপ্লবীদের মতো নারীরাও তাদের শরীরকে অনশনের অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন, যাতে তারা শুধুমাত্র জৈবিক নারীদেহ নয়, বরং এক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান। ঔপনিবেশিক বাংলার কারাগারে নারীদের অনশন ধর্মঘট তাদের আত্মত্যাগী জাতীয় চেতনার প্রকাশ হিসেবে দেখা দেয়।[১৬]

আরেকটি বিষয়ও এখানে প্রাসঙ্গিক। জেলে জাতীয় পতাকা তোলার নিয়ম নেই নিয়মটা এমন যে সেখানে একমাত্র থাকবে, ইংরেজদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। কিন্তু জেলে সেই সময় ভিড় করেছে আইন অমান্যকারী বন্দি মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে আভা দে ছিলেন অত্যন্ত সাহসী একজন। তিনি একদিন ফিমেল ওয়ার্ডের বিরাট অশ্বত্থ গাছের ওপর উঠে উড়িয়ে দেন ভারতের জাতীয় পতাকা, ধ্বনি তোলেন বন্দেমাতরম। জেলার, জমাদার, সিপাহি-রা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসেন। জেলখানায় তোলপাড় পড়ে যায় ইংরেজ রাজত্ব বুঝি যায় যায়।[১৭] যদিও জমাদারনী, মেট্রন নিমেষের মধ্যেই জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন, তবুও বিষয়টি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে ভীত করার জন্য ছিল যথেষ্ট। যেখানে প্রথমদিকে কারাগারে নারীবন্দিনী-দের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত, তাঁদের জন্য ছিল না যথেষ্ট পরিকাঠামো, সেখানে একসময় এই নারীরাই ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক ভারতে বিপ্লবীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, তাঁরাই সশস্ত্র পথে হেঁটে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন; তাঁদের স্বপ্ন ছিল মাতৃভূমির সমাজ, রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন। ভারতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শের সাথে কমিউনিস্ট মতাদর্শের কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হলে বিপ্লবীদের অনেকেই সেই আন্দোলনে শামিল হন। কমিউনিস্টরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রেণি সংগ্রামের পথে হেঁটে আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতের বিপ্লবীদের মতো ১৯৬০-এর দশকে বাংলাতে শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা। কেবল বদলে গিয়েছিল রাষ্ট্রশক্তি; ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে তখন স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার।

স্বাধীনোত্তর সময়কালে কারাগার ও নারীবন্দিনী

সালটা ১৯৬৭, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি গ্রামে নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। এই আন্দোলন ছিল মাওবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল ও কানু সান্যাল-রা, যাঁরা গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক ও আদিবাসীদের সংগঠিত করে এক সশস্ত্র রাষ্ট্রবিরোধী বিদ্রোহ শুরু করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার ও উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে উৎখাত করে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।[১৮]

১৯৭০-এর দশকে নকশালপন্থা কলকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গবেষক শ্রীলা রায় তাঁর লেখায় ১৯৭০-এর দশকে নকশাল নারীদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আত্রেয়ী সেন তাঁর *Slaps, Beatings, Laughter, Adda, Puppet Shows: Naxal Women Prisoners in Calcutta and the Art of Happiness in Captivity* নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, নারী নকশালরা প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় কারাবন্দিদের আওতায় এসে এক গভীর বিভ্রান্তির সম্মুখীন হন। রাষ্ট্র '*নারী বিপ্লবী*' এই ধারণা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অদক্ষ ছিল।[১৯] নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে জেলবন্দি হয়েছিলেন জয়া মিত্র। তিনি *হন্যমান* গ্রন্থে তাঁর কারাগারের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। মেদিনীপুর, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি হয়ে তিনি কাটিয়েছেন চার বছর। কারাগারের অভ্যন্তরীণ জীবন, অন্যান্য বন্দিনীদের সাথে সম্পর্ক, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে তাঁর হন্যমান গ্রন্থে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করব। প্রথমেই তিনি তাঁর লেখনিতে কারাগারের অচলাবস্থার কথা তুলে ধরছেন, তিনি দেখাচ্ছেন পুরো ফিমেল ওয়ার্ডে ছিল একটিমাত্র কল যা সবার প্রয়োজন মেটাতে পারত না। যে ভুট্টার খিচুড়ি তাঁদের খেতে দেওয়া হতো তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। জয়া মিত্র এই প্রসঙ্গে বলছেন, তা *"পৃথিবীর জল স্থলের জলের অনুপাত-এর চেয়ে বেশি"।* দেওয়া হতো কালো ময়লা রুটি, যা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে খেতে হতো। অর্থাৎ খাবার ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। খাবার জল বাদে বন্দিদের জন্য বরাদ্দ জলের পরিমাণ ছিল মাত্র তিন থালা, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে নিজের সাধের চুল ছোট করে কেটে ফেলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জয়া। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উপায় ছিল না, তবু নারীবন্দিনীরা মিলেমিশে থাকার মাধ্যমে এই কঠোর পরিস্থিতিকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করত।[২০]

তাঁর লেখনিতে উঠে এসেছে তাঁর সহবন্দিনীদের কথা। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলে আসার পর যাঁরা হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় পরিবার। মেদিনীপুর জেলের ফিমেল ওয়ার্ড-এ তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল মারাঠি মেয়ে টি. জয়লক্ষ্মীর, যিনি বাংলা শেখায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বন্দিনী গঙ্গা, যার থেকে তিনি শিখেছিলেন শাড়ির আঁচল দিয়ে মসুর ডাল থেকে পোকা ছেঁকে খাওয়ার অভিনব বিষয়টি। জয়া মিত্র বলেন, কারাগারে না এলে এই নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি তিনি বঞ্চিত হতেন।[২১] বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বৃদ্ধা বন্দি বরদা মার সঙ্গে জয়া মিত্রের মা-মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার অসুস্থতায় সারা দুপুর হাসপাতালে বসে থাকেন জয়া এবং সেই সময় অন্যান্য সহবন্দিনীদের সাথে এক থালায় ভাত মেখে খান। জেলের মধ্যে যেন পিকনিকের অনুভূতি পান তাঁরা, পাশাপাশি একে অপরের সাথে ভাগ করে নেন তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনের কথা।[২২] তিনি উল্লেখ করেছেন বন্দিনী ফুলমালার কথা, যে নিজের দুই সন্তানকে হত্যা করে আজীবন কারাদণ্ড পেয়েছিলেন, কিন্তু জেলখানায় তাঁর কোল কোনোদিন ফাঁকা থাকত না। আবেগহীন জেলখানায় এহেন ভালোবাসার ছবি সত্যিই আশা জোগায়। শীতের প্রকোপ থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে মহাক্কা বেগম, মাজেদা তাদের জয়া দিদির কাছে আবদার করেন তাদের সন্তানদের জন্য সোয়েটার বুনে দিতে। সে আবদার মেটাতে সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছে আবেদন জানানো হয় এবং আবেদন মঞ্জুর হয় যা জেল কর্তৃপক্ষের অপেক্ষাকৃত মানবিক দিকটি-ই প্রকাশ করে।[২৩] অবসর সময় কাটাতে তিনি পড়তেন *ফর হুম্ দ্য বেল টোলস*, আনন্দকিশোর মুন্সির *ভেলকি থেকে ভেষজ* এবং *সহজ বেতার শিক্ষা* ইত্যাদি। এভাবেই কেটে যেত দিনগুলি। বর্ষার দিনের এক মজাদার অভিজ্ঞতার বর্ণনা তুলে ধরেছেন তিনি – অবিরাম বৃষ্টিতে জেলের বাগান জলপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই জমা জলে ফুলমালা, ইয়ারি, শান্তি, সুখী সবাই মিলে তাঁরা হাড়ুডু খেলা শুরু করেন। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, খোলা হাসিতে তাঁরা ফিরে যান তাঁদের ছেলেবেলার দিনগুলিতে।[২৪]

উৎসবের দিনগুলিতে জেলখানার পরিবেশ হতো একটু অন্যরকম। অষ্টমীর দিন স্পেশাল খাবার হিসেবে থাকত কফি, যদিও সবাই কফির সাথে যেহেতু পরিচিত ছিল না তাই পোড়া চা বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুটা হলেও বন্দিদের তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলি পালনের সুযোগ পেত। জানা যায়, রমজান মাসে মুসলিম বন্দিদের জন্য পাঠানো হতো ছোটো বালতিতে ভেজানো ছোলা, সূর্য ওঠার আগে বন্ধ ওয়ার্ড-এর মধ্যে মুখ হাত ধুয়ে এই একমুঠো ছোলা চিবিয়ে রোজা শুরু হতো এবং তাদের ইফতারের জন্য পাঠানো হতো শরবত। কালীপূজার পরে ছেলেদের ওয়ার্ডে আয়োজন করা হতো

যাত্রা-র এবং সে যাত্রা দেখতে উপস্থিত থাকতেন মহিলাবন্দিনীরা। হাসি, আনন্দের মাধ্যমে কাটত তাদের পুরো দিনটি।[২৫]

কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হলে তা সশ্রম কারাদণ্ড নামে পরিচিত হয়। জয়া মিত্র তাঁর লেখনির মাধ্যমে নারীবন্দিনীদের কাজের বিবরণ তুলে ধরেছেন। বন্দিনীরা ছোলা ভেজে জাঁতায় পিষে ছাতু তৈরি করত, বাগানে বিভিন্ন ফুলগাছ বসাত এবং বাগান পরিষ্কার করে রাখত, পাগল বাড়ির দেখাশোনা করত এবং মহিলাবন্দিনীদের মধ্যে যারা একটু তাড়াতাড়ি কাজ শিখে নিতে পারত তাদের হাসপাতালে রোগী দেখাশোনার কাজে নিয়োগ করা হতো। এর জন্য তাঁরা মাসে ১২ টাকা বেতন পেতেন। উপার্জিত অর্থ তারা অর্ধেক খরচ করতে পারত এবং বাকি টাকা জমা থাকত।[২৬]

জেলে নারীবন্দিনী-রা সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকার মাধ্যমে কারাকর্তৃপক্ষের '*বিচ্ছিন্ন*' করে রাখার নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব গোষ্ঠী। জয়া জানান, তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন, একই অপরাধের কারণে যারা জেলবন্দি হয়েছেন তাদের একই সেলে রাখতে হবে। পাশাপাশি তারা সন্ধেবেলা সিপাহীদের পায়ের কাছে বসে লক-আপ হওয়ার বিরোধিতা করেন এবং নিয়ম ভেঙে লক-আপ হওয়ার পরও একত্রে গান করেন। ফলে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রথমে ভয় দেখিয়ে এবং পরে সিপাহীরা লাঠি দিয়ে নির্মম প্রহার শুরু করে নারীবন্দিনীদের উপর। কিন্তু তাঁদের নির্ভীক, অগ্রাহ্য শেষ পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে তাদের দাবি মানতে। কৃষ্ণা, সাথি, ডালিয়া, স্নিগ্ধা, জয়া এই পাঁচজনকে একই সেলে বন্দি করতে বাধ্য হন তারা।[২৭] কারাকর্মীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছিলেন এই বন্দিনীরা। জানা যায়, জেলে বন্দিদের জন্য বরাদ্দ খাবারের একটি বৃহৎ অংশ নিজেদের জন্য আগেই সরিয়ে রাখতেন কারাকর্মীরা। '*পাগল*' ওয়ার্ড-এর জন্য মাখন, ডিম, পাউরুটি ইত্যাদি যে বিশেষ খাদ্যের সরবরাহ করা হতো তার কিঞ্চিৎ অংশই তারা পেতেন, বাকি যেত এদের পকেটে। যে কারাগার বন্দিদের অপরাধ মুক্ত করার উদ্দেশে তৈরি হয়েছিল, সেই কারাগারই হয়ে উঠেছিল অপরাধ, দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। অভিযোগ জানিয়েও কাজ না হওয়ায় একদিন ওয়ার্ডার-কে হাতেনাতে ধরেন শিখা, লালমতি, জয়া-রা। হাতেনাতে প্রমাণ দেওয়ার পরেরদিনই কারা কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেন এবং জেলার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দিদের খাবার সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করেন, পাশাপাশি ওয়ার্ডারের স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়।[২৮] এইভাবে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মাধ্যমে নারীবন্দিনীরা কারা কর্তৃপক্ষকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতেন; বন্দিনী-রা তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে কারা কর্তৃপক্ষের বিপরীতে নজরদারির এক পাল্টা সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন, যা কারাগারের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির প্রতিরোধে কার্যকরী ছিল।

এছাড়াও *'হাঙ্গার স্ট্রাইক'* ছিল প্রতিরোধের একটি অন্যতম অস্ত্র। রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় জয়া মিত্রের সেলের দরজা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হতো, দিনে মাত্র ১৫ মিনিট তাঁর বাইরে থাকার অনুমতি ছিল। সেলের বাইরে থেকে ভাত, তরকারি ইত্যাদি খাবার ভেতরে ছুঁড়ে দেওয়া হতো। এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি দু-দিন খাদ্যগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারা-কর্তৃপক্ষ তাঁর জেদের কাছে নতি স্বীকার করেন এবং গরাদের দরজা ৮ ইঞ্চি ফাঁক করে ভেতরে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[২৯]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ের কারাগারে নারীবন্দিনী-দের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলাম। এক্ষেত্রে তিনজন রাজনৈতিক নারীবন্দিনীর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই রাজনৈতিক বন্দিনীদের সাথে সাধারণ বন্দিদের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার মাধ্যমে তাঁরা কারাকর্তৃপক্ষের অত্যাচার, দমনমূলক নীতি প্রতিহত করেও টিকে থাকতে পারেন। বন্দিনীরা সম্মিলিত প্রতিবাদ, একে অপরের পাশে থাকার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন, তাঁরা কেউ একা না, বরং পরস্পর নির্ভরশীলতায় বাঁধা। ঔপনিবেশিক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম এই বন্দিনী-রা কীভাবে সবাই মিলেমিশে রয়েছেন, হাসি-ঠাট্টা, পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে নরকসম জেলজীবনকে সহজ করে তুলছেন। যে জেলজীবনে প্রবেশের মাধ্যমে বন্দিনী-রা সমাজ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন, সেই জেলেই তাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের দ্বিতীয় পরিবার। কেউ হয়ে উঠেছেন মা, কেউ দিদি, কেউ বোন। নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁরা জেলের শৃঙ্খলের মধ্যে পেতে চেয়েছেন

স্বাধীনতার স্বাদ, আঁকতে চেয়েছেন মুক্তির রেখা এবং এর মাধ্যমে আমরা কারাগারের এক অন্য রূপের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

সুত্রনির্দেশ:

১. Chauhan, Kashish, (2023). *Historical Evolution of Prison System in India*, UPES Law College, p. 23.
২. Upadhyay, Vasudeva, (1978). A *Study of Hindu Criminology*, Chaukhambha Orientalia, pp. 322-323.
৩. Sangar, Satya Prakash, (1967). *Crime and punishment in Mughal India*, Sterling Publishers (P) Ltd., p. 34.
৪. Sen, Madhurima, (2007). *Prisons in Colonial Bengal 1838-1919*, Thema Books, vol 47, Issue 3, pp. 6-8.
৫. *Ibid*, pp. 8-10.
৬. Bag, Animesh, (2025). *The Colonial Prison in Bengal 1860-1945, History, Governmentality, and Colonial Experiences in Literary writings*, Palgrave Macmillan, pp. 220-221.
৭. Forbes, Geraldine, (2008). *Women in Modern India*, The New Cambridge History of India, Cambridge University Press, IV.2, pp. 138-139.
৮. *Ibid*, pp. 141.
৯. দাশগুপ্ত, কমলা, (১৯৫৪), *রক্তের অক্ষরে, নাভানা*, পৃ. ৮৯-৯০।
১০. দাস, বীণা, (২০১৫), *শৃঙ্খল ঝংকার*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, পৃ. ৩৭
১১. *তদেব*, পৃ. ৮১
১২. দাশগুপ্ত, কমলা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২
১৩. দাস, বীণা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
১৪. দাশগুপ্ত, কমলা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬
১৫. দাস, বীণা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
১৬. Bag, Animesh, *Ibid*, pp. 225-226
১৭. দাশগুপ্ত, কমলা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
১৮. Banerjee, Sumanta, (2009*). In the wake of Naxalbari- four Decades of a Simmering Revolution*, Sahitya Samsad, p. 33.
১৯. Kaur, Raminder, Dave-Mukherjii, Parul (2014) (Ed.). *An essay by Sen, Atreyee, Slaps, Beatings, laughter, Adda, Puppet Shows: Naxal Women Prisoners in Calcutta and the art of Happiness in Captivity*, Bloomsbury, p.122.
২০. মিত্র, জয়া, *হন্যমান*, (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯), কামিনী প্রকাশালয়, পৃ. ২১
২১. *তদেব*, পৃ. ১৬
২২. *তদেব*, পৃ. ৩৪
২৩. *তদেব*, পৃ. ৩৭
২৪. *তদেব*, পৃ. ৭২
২৫. *তদেব*, পৃ. ১৮
২৬. *তদেব*, পৃ. ৪৬
২৭. *তদেব*, পৃ. ৪০
২৮. *তদেব*, পৃ. ১০৯
২৯. *তদেব*, পৃ. ২৯